তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক জীবন

উৎসর্গ

ত্রৈমাসিক ‘নতুন দিগন্ত’ পত্রিকায়
আমার দুই সহকর্মী
মিজানুর রহমান সরকার ও তাপস দাসকে

কথাপ্রকাশের উদ্যোগ

এই বইটি প্রথম প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে, প্রকাশ করেছিলেন মুক্তধারার জহরলাল সাহা। প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তধারা এখন আর আগের মতো প্রাণবন্ত নেই। চিত্তরঞ্জন সাহা থাকলে বইটি তিনিই প্রকাশ করতেন। তাঁর অবর্তমানে জহরলাল সাহা এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রবিয়োগে তিনিও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। বইটি পুনরায় প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল; কথাপ্রকাশের অদম্য-উৎসাহী স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন উদ্যোগ নিয়ে এটিকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন।

তাজউদ্দীন আহমদ আমাদের ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের অংশ। ইতিহাস ভোলা আর স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া আসলে একই কথা। তাজউদ্দীন আহমদ বীর হতে চাননি, নেতা হতেও আগ্রহী ছিলেন না; কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে, এবং তখন তাঁর অন্তর্গত বীরত্বব্যঞ্জক গুণগুলোর অতিসুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের অতীত ও বর্তমানকে বোঝা এবং ভবিষ্যতের পথ খোঁজার জন্য তাঁকে জানা প্রয়োজন। এ বই সেই প্রয়োজন মেটানোরই ছোট্ট একটি চেষ্টা মাত্র।

২১ অক্টোবর ২০২৪

ভূমিকা

'তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক জীবন' একটি স্মারক বক্তৃতা হিসেবে লিখিত হয়েছিল, ২০১৪ সালে। তাজউদ্দীন আহমদ আমাদের ইতিহাসে এমন একটি দায়িত্ব পালন করেন যার জন্য নিজে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি তিনি হয়তো কল্পনাই করেননি যে অমন একটি দায়িত্ব তাঁকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। ইতিহাস যে-ধারায় এগোচ্ছিল সেই ধারায় এগিয়ে যাবার জন্য তাঁর মতো একজনের প্রয়োজন ছিল, এবং ইতিহাস তাঁকে ঠিকই খুঁজে নিয়েছিল। তাজউদ্দীন আশঙ্কা করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন হবার পর হয়তো তিনি আর বেঁচে থাকবেন না; ঠিক সেটাই ঘটেছে। তার আগেই অবশ্য তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

তাজউদ্দীন আহমদের প্রতিপক্ষ বাইরে ছিল, ছিল ঘরের ভেতরেও। ঘরে-বাইরে এই বিরূপতার কারণ অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণপন্থী ছিলেন না। দেশ স্বাধীন হবার পর দক্ষিণপন্থীরা প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং তারা প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে, পরে জেলখানায় গিয়ে হত্যা করেছে চারজন নেতাকে, যাঁদের মধ্যে তাজউদ্দীনই ছিলেন প্রধান।

এসব ছিল তাঁর বাইরের ভূমিকা। ভেতরে তাঁর প্রস্তুতিটা কেমন ছিল, কীভাবে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন সেটাও আমাদের জানা দরকার;

কেননা তিনি কেবল তাঁর নিজের নন, তিনি আমাদেরও। তাঁকে জানার ভেতর দিয়ে তাঁর শ্রেণী ও সময়কেও চেনা যাবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তরও হয়তো পাওয়া যাবে যে, কেন তিনি বামপন্থী জাতীয়তাবাদীই রইলেন, পুরোপুরি বামপন্থী হলেন না।

তাজউদ্দীন আহমদের কাছে আমাদের খুব বড় একটা ঋণ রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে জানলে সেই ঋণের চরিত্রটাও বোঝা যাবে।

এই সকল দিক বিবেচনাতে রেখেই লেখাটি তৈরী করেছিলাম। জহরলাল সাহাকে ধন্যবাদ সেটিকে বইয়ের আকারে প্রকাশ করার জন্য।

তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সাফল্য ও অবদান সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। প্রশ্ন থাকে দু'টি। প্রথমটি, কেন তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হলেন এবং দ্বিতীয়টি, কোন ধরনের রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল। রাজনীতিতে তাঁর যুক্ত হওয়ার একাধিক কারণ আছে; একটি বাইরের, অনেক ক'টি ভেতরের। বাইরের কারণটি মানুষটির ভেতরের গুণগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে, এবং রাজনীতিতে যোগদান অপরিহার্য করে তুলেছে। কেবল যোগদান তো নয়, রাজনীতিই ছিল তাঁর জীবনের মূল প্রবাহ।

বাইরের কারণটিকে বলা যেতে পারে যুগের হাওয়া; আর তাঁর আত্মগত গুণগুলোর ভেতর প্রধান ছিল সংবেদনশীলতা এবং কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ। তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ১৯২৫ সালে, কিশোর বয়সেই তিনি চতুর্দিকে রাজনৈতিক তৎপরতা দেখেছেন; ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন জোরেশোরে চলছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র হচ্ছিল। যুগের ওই হাওয়াতে তাজউদ্দীনের সংবেদনশীলতা এবং ভেতরের কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ সাড়া দিয়েছে। যার ফলে তিনি কৈশোরেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন।

১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি কলেজে ভর্তি না-হয়ে রাজনীতিতে চলে যান; প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছিলেন;

তিন বছর পরে মূলত মায়ের চাপে আই.এ. পড়া শুরু করেন। সরকারী ঢাকা কলেজেই ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করা হয়নি, রাজনৈতিক কাজের প্রতি আগ্রহের কারণে। যে জন্য একটি বেসরকারী কলেজ থেকে অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অথচ ছাত্র হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং গ্রন্থপাঠে আগ্রহ ছিল অপ্রতিরোধ্য। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি দ্বাদশ স্থান পেয়েছিলেন। সেটি অবিভক্ত বাংলার ঘটনা, তখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ড ছিল একটাই। পরে ১৯৪৮ সালে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন অর্থনীতিতে অনার্স পড়বেন বলে। সময়মতো পরীক্ষা দেওয়া হলো না; রাজনৈতিক কারণেই। এক বছর পরে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন, ভর্তি হলেন আইন বিভাগে। যখন আইন পড়ছেন তখন তিনি ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য; সদস্যদের ভেতর বয়সের দিক থেকে সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ। আইউব খানের সামরিক শাসনামলে কারাগারে যেতে হয়েছে, আইনে ডিগ্রীর জন্য পরীক্ষা দিতে হয় বন্দী অবস্থা থেকেই। রাজনীতি তাঁকে ছাড়ে নি, তিনিও রাজনীতিকে ছাড়েন নি। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেই ছিলেন; ওই রাজনীতিতে দক্ষিণ ও বামের ব্যবধান ছিল, স্পষ্ট ব্যবধান। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ওটি তো থাকবেই, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন যে, উপমহাদেশের কমিউনিস্টদের ভেতরেও দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন, যেমন ছিলেন বামপন্থীরা। তাজউদ্দীন আহমদের অবস্থান জাতীয়তাবাদের বামপন্থী সীমান্তে; সে-সীমান্তটি পার হয়ে যাওয়া যায় কি না সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করতেন, যদি না তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটত। তিনি তো চলে গেলেন মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে। যুগের হাওয়াটা বেশ প্রবল ছিল সন্দেহ কী। কিন্তু সকলে তো তাতে সমানভাবে সাড়া দেন নি। রাজনীতিকে সার্বক্ষণিক কাজ ও চিন্তা হিসেবে যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যা স্বল্পই ছিল। রাজনীতি করলে এখন যেমন সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাঁর সময়ে তেমনটা একেবারেই ছিল না। রাজনীতি

তখন অসুবিধার আকর, বিপদের প্রত্যক্ষ ঝুঁকি। অথচ সেই অসুবিধার পথেই তিনি চলে গেলেন, দ্বিধা না করে। ইচ্ছা করলে অন্য পেশায় যেতে পারতেন এবং যেটাতেই যেতেন মেধা ও পরিশ্রমের যে সমন্বয় তাঁর ভেতর ছিল তাতে শীর্ষেই পৌঁছবার কথা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে আমলা হতে পারতেন, মেধাবান তরুণদের পক্ষে ওই দিকেই ছোটাছুটি করাটা ছিল সাধারণ প্রবণতা। আইনজীবী হওয়ার পথও খোলাই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার পথে কোনো বিঘ্ন ছিল না। বিষয়সম্পত্তি ছিল; উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গাজমি, চরভূমি এবং বন পেয়েছেন; সেখানে ধান, পাট, রবিশস্যের চাষ হয়। বনের কাঠ বিক্রি করে টাকা আসে। পারিবারিক আয়ের ওপর ইনকামট্যাক্স দিতে হয়। তাঁদের এলাকায় বেপারীরা ছিলেন বিত্তশালী। তাজউদ্দীনও পারতেন ব্যবসা-বাণিজ্যে যেতে, এবং তাতে ধনপ্রাচুর্য অর্জন ছিল অবধারিত। কিন্তু ওসব দিকে না গিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন, ভেতরের সংবেদনশীলতা, কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধের তাড়নাতে। সংবেদনশীলতার দিকটায় তাকানো যাক। তাঁর অনুভূতির জগতের খবর পাওয়া যাবে নিয়মিতভাবে লেখা তাঁর ডায়েরীতে।[১] ডায়েরী তিনি ইংরেজীতে লিখেছেন; কবি বেলাল চৌধুরী দ্বারা বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। ইংরেজীতে লেখার একটা কারণ হয়তো এটা যে ওই ভাষার চর্চা তখন স্বাভাবিক রীতি ছিল। তাছাড়া তিনি মিশনারীদের স্কুলে পড়েছেন, সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজী লেখার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। আরেকটা কারণ হতে পারে আবেগকে সংযত রাখা এবং নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে চেষ্টা করা। বাংলায় লিখলে হয়তো বাকসংযম অতটা রক্ষা করা কঠিন হতো, যতটা তিনি রক্ষা করেছেন। তবুও মাঝে মাঝে দেখা যায় আপনজনদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ব্যবহার পেয়ে মুষড়ে পড়েছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে হঠাৎ করে দুর্ব্যবহারে তাঁর রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে।

এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরে বস্তুগত জগতের অন্তত চারটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা থেকে তাঁর অন্তর্জগতের

প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। ২৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ লিখছেন যে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশপথে দেখেন মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধা উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে মিটফোর্ড হাসপাতালে টেলিফোন করলেন। কেউ সাড়া দিলো না। তখন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানালেন এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই; পরামর্শ দিলেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মুসলিম লীগ অফিসে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারকে ফোন করলেন; তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। এরপরে স্টেশনে গিয়ে দেখেন মহিলা সেখানেই পড়ে আছেন। কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলে একজন আরেকজনকে নোট লিখলেন। বোঝা গেল কেউ কর্ণপাত করছে না। নোটের কপি নিয়ে তাঁরা ওপরের অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসারটি যথার্থ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নোট দিলেন। এভাবে একটি জীবনের ওপর সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমলাতন্ত্রীয় দৌরাত্ম্য চলল। সন্ধ্যায় মহিলাকে আর পাওয়া গেল না। তাজউদ্দীন লেখেন নি, আমরা অনুমান করি যে মহিলা বাঁচেন নি, হয়তো তাকে বাঁচানো যেতো যদি কর্তৃপক্ষ কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিত।

এটি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দ্বিতীয় সপ্তাহের ঘটনা। তরুণ তাজউদ্দীন তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ডায়েরীতে বিবরণগুলো এমনিতে খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু এটিকে বিস্তারিত করে লিখেছেন। বোঝা যায় তিনি কতটা আহত ও বিচলিত হয়েছেন। স্বাধীনতার প্রকৃত চেহারাটা দেখতে পেয়েছেন, বুঝেছেন নতুন রাষ্ট্র কতটা মানবিক হবে! কিন্তু নিজের সংবেদনশীলতা ও কর্তব্যজ্ঞানের যে পরিচয় নিজেই নিজের কাছে দিয়েছেন সেটা তাঁকে অধিকতর রাজনীতিমনস্ক করেছে, এমন কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি। ডায়েরীর লেখাগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কাউকে জানাবার জন্য লেখেন নি, এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তা আমাদের পড়বার কথা নয়; কিন্তু পড়লে নিশ্চিত বুঝি তাজউদ্দীন আহমদ কেন রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। যে-রাষ্ট্র দুস্থ মানুষের

যত্ন না নিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তাকে না-বদলালে যে মানুষের মুক্তি নেই এমন বক্তব্য তাঁর লেখায় কোথাও বাহুল্যসহকারে ব্যক্ত হয় নি, কিন্তু ওই উপলব্ধিটা যে তাঁকে তাড়া করে ফিরছে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

উপরে উদ্ধৃত বিবরণের তুলনায় বিস্তৃত আকারে আছে গান্ধীজির মৃত্যুতে অনুভূতির কথা। ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮-এর সন্ধ্যায় খবরটি পান। ওই দিনের এবং পরের দিনের দিনলিপিতে গান্ধীর মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য রয়েছে; কিন্তু যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হলো এমন বিস্তারিত বিবরণ তাঁর ডায়েরীগুলোর অন্য কোথাও নেই, এমন শোকপ্রকাশও নয়। শোকটা অবশ্য ছিল সর্বজনীন। তাজউদ্দীনের বিবরণীতেই রয়েছে এ তথ্য যে ঢাকা শহরে সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়েছে, যেটা ছিল অভাবিত। পত্রিকার জন্য কাড়াকাড়ির অমন দৃশ্যও আগে কখনো দেখা যায় নি। ধারণা করি এর পেছনে অন্তত তিনটি কারণ ছিল। তিনটিই বোধের ব্যাপার। প্রথমটি স্বস্তির, দ্বিতীয়টি কৃতজ্ঞতার, তৃতীয়টি গ্লানির। স্বস্তি এই জন্য যে গান্ধীজি কোনো মুসলমানের হাতে নিহত হন নি, ঘাতকেরা ছিল কট্টরপন্থী হিন্দু। কৃতজ্ঞতার বোধ এসেছিল এই জ্ঞান থেকে যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন ভারতে, বিপন্ন মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর গ্লানির উদ্ভব এই সচেতনতা থেকে যে পাকিস্তানের দাবী প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে গান্ধীকে মুসলমানদের চরম শত্রু বলে দেখা হয়েছে। এই শেষের বোধটির উল্লেখ তাজউদ্দীনের দিনলিপিতেও রয়েছে। লিখেছেন, "বিগত দিনে আমিই তো এই মহৎ আত্মার বিরুদ্ধে কত কথা বলেছি। অন্তরের বিশ্বাস থেকে নয়। রাজনীতি থেকে।"

শোক অন্যরাও অনুভব করেছেন, কিন্তু তাজউদ্দীনের শোক ছিল এমন গভীর যা তাঁর নিজের কাছেও বিস্ময়কর। মৃত্যুশোক তাঁকে সাধারণত যে খুব একটা অভিভূত করে এমন নয়; এ বিষয়টি তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। চার বছর আগে তাঁর বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে, এমনকি এক বছর আগে পিতার মৃত্যুতেও, তিনি যে ভেঙ্গে পড়েছিলেন

এমনটা মোটেই নয়। নিজের জন্য নিজেই লিখে রেখেছেন—

> কিন্তু গান্ধীজির মৃত্যুতে আমি তেমনটি হতে পারছিনে কেন? আমি আমার মনের বিষাদকে দুর্বলতা ভেবে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। অনিচ্ছা নিয়ে আমি রাত বারোটায় রাতের খাওয়া খেলাম। আমি ঘুমাতে চাইলাম। কিন্তু আমি ঘুমাতে পারলাম না। জাগ্রত অবস্থাতে গান্ধীজি আমাকে আপ্লুত করে রাখলেন। স্নায়ু বিবশ হলো। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম। কিন্তু তন্দ্রার মধ্যেও তো গান্ধীজি আমাকে আপ্লুত করে রাখলেন।

পরের দিনের বিবরণীতেও এই শোকের কথা লিখেছেন। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, "আমার আর কিছু না থাক চুল আঁচড়াবার বিলাস আছে। হোক সামান্য; তবু তো বিলাস। আজ কিন্তু সেটুকুও আর রইল না। আজ আর আমার গোসল হলো না। ৪৮ ঘণ্টা ধরে আর কেশবিন্যাস ঘটল না।"

ব্যক্তিগত ঘটনার তুলনায় রাজনৈতিক ঘটনাতে তাজউদ্দীনের শোকের এই গভীরতর অনুভবের আর একটি কারণের উল্লেখ দিনলিপিতে রয়েছে। সেটা এই যে গান্ধীজি ছিলেন পথপ্রদর্শক। ২৩ বছর বয়সের ওই যুবক ইতিমধ্যেই রাজনীতিকে অন্য সকল বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখার অভ্যাস করে ফেলেছেন, যে জন্য পারিবারিক শোকের চেয়ে রাজনৈতিক শোক তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। রাজনীতিতে পথপ্রদর্শক হিসেবেও অন্য কাউকে তিনি সামনে দেখতে পান নি। বুঝতে পারি যে, কায়েদে আজম তাঁর কাছে দলীয় কারণে বড় ছিলেন, ব্যক্তিগত মহত্ত্বের কারণে নয়। সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর খুব বড় মনে হয় নি, যার প্রমাণ তাঁর দিনলিপিতেই আছে। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা তাঁর পছন্দ, কিন্তু মওলানা আসামে ছিলেন, সদ্য এসেছেন, তাঁর নেতৃত্বদান তখনো তেমনভাবে শুরু হয় নি। এই শূন্যতার ভেতরে অবস্থানরত যুবকটির কাছে মনে হয়েছে যে, 'পথের দিশারী আলোকবর্তিকা'টি অস্তমিত হলো।'

শোকের এই অনুভূতি তাঁর ভেতরের সংবেদনশীলতার খবরটিও আমাদেরকে জানিয়ে দেয়। সংবেদনশীলতার প্রকাশ আরো আছে।